মেসোপটেমীয় সভ্যতা

৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগেই আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় এক প্রাচীন সভ্যতার উদয় হয়েছিল। এ সভ্যতাকে আগে 'ব্যবিলনীয়' অথবা 'ব্যবিলনীয়-আসিরীয়' নামে আখ্যায়িত করা হত। পরে জানা গেছে যে, ব্যবিলনীয় অথবা আসিরীয়রা কেউই এ সভ্যতার জনক নয়, এর প্রতিষ্ঠাতা হল সুমেরীয় নামে এক জাতি এবং সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, কাসাইট, আসিরীয়, ক্যালডীয় প্রভৃতি জাতির অবদানে দীর্ঘকাল ধরে এ সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাই, সামগ্রিকভাবে এ সভ্যতাকে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

দুই নদীর দেশ

'মেসোপটেমিয়া' নামটা গ্রীকদের দেয়া, এর অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। দুই নদী বলতে অবশ্যই বোঝানো হচ্ছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসকে। মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশের নাম ছিল আসিরিয়া, দক্ষিণাংশের নাম ব্যবিলনিয়া। ব্যবিলনিয়ার ছিল দুটি অংশ—দক্ষিণে সুমের ও উত্তরে আক্কাদ।

মেসোপটেমিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র একই রকম ছিল না। উত্তরাংশে ছিল ক্ষুদ্র পাহাড়ী অঞ্চল, সেখানে বৃষ্টিপাত হত এবং ছোট ছোট নদী ছিল। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশ হচ্ছে জলাভূমি। প্রতি বছর মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত বরফগলা পানিতে টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিসের দু'তীর প্লাবিত হয়ে যেত, তীরে পলি জমত এবং তারপর পানি সরে গেলে মাটি শুকিয়ে উঠত। তাই এখানে কৃষি কাজের উপযুক্ত উর্বর জমি থাকলেও তার জন্যে পানি সরবরাহকে নিয়ন্ত্রিত করার আবশ্যকতা ছিল।

মিশরের তুলনায় মেসোপটেমিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ কম ছিল। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে চুনাপাথর ও কাদামাটি ছিল; এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে ছিল খেজুর ও নলখাগড়া, চারপাশের পাহাড়সমূহে ছিল গবাদি পশু, ছাগল, বরাহ ও সিংহ, আর নদীতে ছিল প্রচুর মাছ।

সুমের ও আক্কাদ

৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সমকালে সুমেরীয় নামে পরিচিত একজাতের মানুষ মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে এবং পারস্য উপসাগরের উপকূল ধরে বাস স্থাপন করে। এদের উৎপত্তিস্থল এখন পর্যন্ত অজানা, তবে অনুমান করা হয়, মধ্য এশিয়ার মালভূমি থেকে এরা এসেছিল। সুমেরীয়দের আগমনের পূর্বে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় যারা বাস করত তারা তখন নতুন পাথরের যুগ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের অবস্থায় এসে

মাত্র পৌঁছেছিল। সুমেরীয়রা স্থানীয় অধিবাসীদের সহজেই পরাস্ত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সুমেরীয়রাই প্রথম এ অঞ্চলে খাল খনন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে সেচব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং তার ভিত্তিতে নগরসভ্যতা নির্মাণ করে। ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় প্রায় কুড়িটি নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। নগররাষ্ট্রের শাসকদের বলা হত 'পাতেজি'. এঁরা ছিলেন একাধারে পুরোহিত, সেনানায়ক ও সেচব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক। পানির অধিকার নিয়ে এবং আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এ সকল নগররাষ্ট্রের মধ্যে অনবরত মারামারি লেগেই থাকত।

একই সময়ে উত্তর ব্যবিলনিয়া বা আক্কাদে সেমিটিক ভাষাগোত্রের একটি দল বাস করত, এরা সম্ভবত আরবের মরুভূমি থেকে এসেছিল। এ আক্কাদীয়রা কৃষিকাজ আয়ত্ত করে এবং নগররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আক্কাদীয়রা অনেককাল ধরেই সুমেরীয় নগরসমূহ অধিকার করার চেষ্টা চালিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উন্নত অস্ত্রের সাথে শক্তিতে পেরে ওঠে না। অবশেষে আক্কাদের শাসক ১ম সারগন সুমেরের নগররাষ্ট্রসমূহ অধিকার করে নেন। সারগন ছিলেন এক প্রতিভাবান শাসক ও সামরিক নেতা। তিনিই ইতিহাসে সর্বপ্রথম গ্রাম কমিউনের গরিব কৃষকদের থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সারগন পরাজিত সুমেরীয়দের সভ্যতা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য, মাঝে মাঝে গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহ ঘটা সত্ত্বেও, দু'শ' বছরের বেশি টিকে ছিল। সারগন মেসোপটেমিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত 'এলাম' রাজ্য জয় করেন এবং সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের অংশবিশেষ অধিকার করেন। সারগন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের রাজারা নিজেদের 'সুমের ও আক্কাদের রাজা' বলে পরিচয় দিতেন।

সারগন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সারগনের মৃত্যুর পরেই সুমেরীয়গণ বারবার বিদ্রোহ করতে থাকে। সারগন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এতে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গূর্তি নামক এক বর্বর জাতি এ রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করে। অবশেষে ২১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উর নগরীর নেতৃত্বে সুমেরীয়গণ গূর্তিদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে বিদ্রোহ করে এবং সমগ্র সুমের এবং আক্কাদের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। নতুন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন 'ডুঙি'। এ সম্রাটের আমলেই সর্বপ্রথম সুমেরীয়গণ একজন সুমেরীয় শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

ব্যবিলনীয় সভ্যতার উদয়

সুমের-আক্কাদ সাম্রাজ্য ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়লে ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের প্রাক্কালে আরব অঞ্চল থেকে আগত আমোরাইট জাতি আক্কাদ অধিকার করে নেয় এবং এলামদেশীয় একটি দল সুমের দখল করে। এদের মধ্যে ক্রমশ লড়াই বেধে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এলাম-দেশীয়রা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। বিজেতাদের রাজ্য 'ব্যবিলন' নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং ব্যবিলন অতি দ্রুত এক বড় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ ব্যবিলনীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল আমোরাইটদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সম্রাট 'হাম্মুরাবির' আমলে (১৯৭২-১৭৫০ খ্রিঃ পূঃ)। পরবর্তীকালের নব ব্যবিলনীয় তথা ক্যালডীয় সভ্যতার সাথে

পার্থক্য বোঝানোর জন্যে এ সভ্যতাকে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিবর্তনের এটি দ্বিতীয় পর্যায়। হাম্মুরাবি ব্যাবিলনের উত্তরে অবস্থিত মারি রাজ্য অধিকার করেন এবং উত্তরে আসিরিয়া পর্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করেন। হাম্মুরাবি কেবল বড় শাসক হিসেবেই নন, বিখ্যাত আইন-সংহিতার প্রণয়নকারী রূপেও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। হাম্মুরাবির আইন-সংহিতা থেকে প্রাচীন ব্যাবিলনের সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়— পুরোহিত, ভূস্বামী, বণিক, ভূমিদাস ও দাস ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত তৎকালীন সমাজের চিত্রও পাওয়া যায়।

হাম্মুরাবির পর তাঁর সাম্রাজ্য ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ১৬৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে কাসাইটগণ ব্যাবিলন রাজ্য জয় করে নেয় এবং প্রায় ৬০০ বছর তাদের আধিপত্য বজায় থাকে। কাসাইটরা পূর্বাঞ্চলের পাহাড় থেকে এসেছিল। এরা ছিল বর্বর জাতি এবং ব্যাবিলনের সংস্কৃতিতে তারা ছিল নিতান্তই আগ্রহশূন্য। তাদের একমাত্র অবদান হল, মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে ঘোড়ার প্রচলন। কাসাইটদের সমকালে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় 'মিতানি' নামক একটি আর্যভাষী দল রাজ্য স্থাপন করে; এ উভয় রাজ্যই ক্রমশ ইতিহাস থেকে লোপ পেয়ে যায় এবং এ অঞ্চলে উদিত হয় সুবিখ্যাত আসিরীয় সাম্রাজ্য— যারা প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ করে তাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে।

আসিরীয় সাম্রাজ্য

৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে একটি সেমিটিক ভাষাভাষী দল উত্তর মেসোপটেমিয়ার আসুর নামক নগররাষ্ট্রে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে: এরাই কালক্রমে আসিরীয় নামে পরিচিত হয়। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকায় তাদের আধিপত্য বিস্তার মেসোপটেমীয় সভ্যতার তৃতীয় পর্যায়ে উত্তরণের সূচনা করে।

আসিরীয় শক্তির বিকাশ ঘটতে শুরু করে ১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে এবং তার অল্পকালের মধ্যেই তারা সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়ার কর্তৃত্ব অর্জন করে। খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর দিকে তারা ব্যাবিলনিয়া থেকে অবশিষ্ট কাসাইট শক্তিকে উৎখাত করে। আসিরীয় সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ বিস্তৃতি ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে। '৩য় তিগলাথ পিলেসার' (৭৪৫-৭২৭ খৃঃপূঃ) অনেকগুলো সফল অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সিরিয়া ও ফিনিশিয়া অধিকার করেন উরারতু রাজ্যকে পরাজিত করে। টায়ার ও ইসরায়েলের রাজারা তাঁকে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। সবশেষে তিনি ব্যাবিলনিয়া পুরোপুরি জয় করে নেন। পরবর্তী সম্রাটগণের, যথা, ২য় সারগান (৭২২-৭০৫ খৃঃপূঃ), সেন্নাচেরিব (৭০৫-৬৮৯ খ্রিঃ পূঃ), এসারহাদন (৬৮০-৬৬৯ খৃঃপূঃ) এবং আসুরবানিপাল (৬৬৮-৬২৬ খৃঃপূঃ)-এর আমলেও আসিরীয়দের বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে। এ ভাবে আসিরিয়া রাষ্ট্র এশিয়া মাইনরের মধ্য ও পূর্ব অংশ, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ফিনিশিয়া, ইসরায়েল ও মিশরের একাংশ স্বকবলিত করে এক বিশাল সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। সেকালের হিসেবে আসিরিয়া নিঃসন্দেহে এক বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। সেন্নাচেরিব-এর আমল থেকে আসিরিয়ার রাজধানী ছিল নিনেভে নগরী।

আসিরিয়া ছিল সমরনায়ক ও দাসমালিক পরিচালিত রাষ্ট্র। মিশর বা ব্যাবিলনিয়ার চেয়ে এখানে দাসপ্রথা অনেক বেশি বিকাশ লাভ করেছিল। আসিরিয়ার সম্রাটের আজ্ঞাধীন শত সহস্র দাস ছিল— যাদের রাস্তা তৈরি, খাল খনন, এমনকি পুরো নগরনির্মাণের কাজে নিয়োগ করা হত।

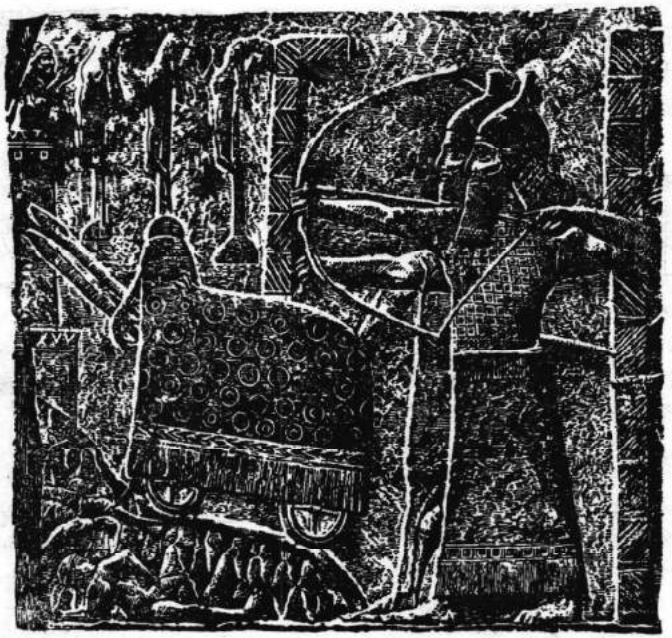

আসিরীয়গণ একটি দুর্গকে আক্রমণ করছে।

আসিরীয়দের সাফল্যের কারণ

আসিরীয় সম্রাটদের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের সাফল্যের পশ্চাতে তিনটি কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রথমত আসিরীয়দের ছিল পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী।

দ্বিতীয়ত আসিরীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতিকে বাধাদানকারীদের নিষ্ঠুর ভাবে দমন করা হত।

তৃতীয়ত আসিরীয়দের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল তৎকালীন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা।

আসিরীয়দের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেনাবাহিনীর দ্বারা এবং সেনাবাহিনীর স্বার্থে। এ বাহিনী ছিল তৎকালীন বিশ্বে সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে সুশিক্ষিত। এ সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণভাবে লৌহনির্মিত সমরাস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত। এদের প্রধান অস্ত্র

ছিল লৌহফলকবিশিষ্ট তীর ও ধনুক। আসিরীয়দের আক্রমণ কৌশল ছিল নিম্নরূপ।

প্রথমে শত্রুর দিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে নিক্ষিপ্ত শত সহস্র তীরের আঘাতে তারা শত্রুকে দুর্বল করে দিত। তারপর তাদের ভারি রথসমূহ ও অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুর ব্যূহভেদ করে মুহূর্তে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ধূলিসাৎ করে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করত। সে যুগের সকল জাতি এই দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনীকে ভয় পেত। বিজয়ী সৈন্যরা এরপরে তাদের বিজয় উৎসব পালন করত। সৈন্যরা তাদের লুণ্ঠিত মালামাল প্রদর্শন করত প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সাথে সাথে তারা এনে হাজির করত সেই সমস্ত ধৃত যুদ্ধবন্দীদের যাদেরকে অচিরেই নিষ্ঠুরতম অত্যাচার দ্বারা মৃত্যুর পরপারে পাঠিয়ে দিত। সমষ্টিগত বাহিনীর আনন্দ, পান ও ভোজনের মাধ্যমে এই বিজয়োৎসবের সমাপ্তি ঘটত।

আসিরীয়ার রণসাফল্যের আরেকটি বিশেষ কারণ তাদের নিষ্ঠুরতম অত্যাচার ব্যবস্থা— যার দ্বারা তারা সকল শত্রুকে ভয় পাইয়ে দিতে সক্ষম হত। প্রাচীন বিশ্বে এদের মতো নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আর কেউ ছিল না। বিজিত আসিরীয় সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে থাকা আহত শত্রু সৈন্যদের মাথাগুলো কেটে নিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করত। তার পরে প্রচণ্ড উল্লাসে তারা পৈশাচিকতার সাথে গণহত্যায় লিপ্ত হত; নগরের পর নগরে অগ্নিসংযোগ করত এবং যুদ্ধবন্দীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত।

একজন আসিরীয় সম্রাট গর্বভরে লিখে গেছেন॥ ''আমি তাদের (শত্রুর) ধন-সম্পদ, গবাদিপশু ও ভেড়াগুলি নিয়ে এলাম। অনেক বন্দীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললাম। আমি জীবিতদের পরস্পরের উপর সাজিয়ে একটি স্তম্ভ তৈরি করলাম ও মাথাগুলি দিয়ে আর একটি স্তম্ভ নির্মাণ করলাম, শহরের প্রকাশ্য স্থানে বৃক্ষের ডালে ডালে আমি মস্তকগুলি ঝুলিয়ে দিলাম, তাদের ছেলেমেয়েদের আমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলাম। আমি পুরো শহরটা বিধ্বস্ত করলাম, খুঁড়ে ফেললাম, তাতে অগ্নিসংযোগ করলাম এবং সর্বশেষে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম।'' এভাবেই প্রতিটি আসিরীয় সম্রাট তাদের বিজয়াভিযান সম্পন্ন করেছিলেন।

আসিরীয়দের সাফল্যের তৃতীয় কারণ তাদের শাসকদের দ্বারা নির্মিত রাষ্ট্র শাসনপদ্ধতি। আসিরীয় সম্রাটগণ বিজিত রাজ্যের প্রজাদের তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করে অন্য রাজ্যে নির্বাসিত করতেন। এভাবে এক রাজ্যের প্রজাকে অন্যরাজ্যে স্থাপন করে যদিও তারা নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিয়েছেন— তথাপি এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে এক আন্তর্জাতিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। আসিরীয়রা একটি আন্তর্জাতিক ও কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে মিশরীয়দের থেকে উৎকৃষ্ট একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল। সম্রাটের বার্তাবাহকগণ সর্বদা রাজনির্দেশ বহন করে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে পৌঁছে দিত। কেন্দ্রে সাথে প্রদেশের যোগাযোগের জন্য তৈরি হয়েছিল উৎকৃষ্ট সড়ক ও জনপথসমূহ। তদুপরি আসিরীয়রাই তৈরি করেছিল পৃথিবীর প্রথম ডাকব্যবস্থা। এভাবে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে আসিরীয় সম্রাটগণ তাদের শাসনব্যবস্থা সাফল্যের সাথে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক্যালডীয় বা নব-ব্যাবিলনীয়সাম্রাজ্য

আসিরীয় শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আসিরীয় সম্রাটরা বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নির্মম স্বৈরাচারী আসিরীয় শাসনের অধীনে পদানত জাতিসমূহ বিদ্রোহোন্মুখ হয়ে থাকে এবং ব্যাবিলনবাসী ক্যালডীয়রা (ইরান মালভূমির মেডেসদের সাথে মিলিত হয়ে) ৬১২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয় রাজশক্তিকে চূর্ণ করে। ক্যালডীয়া স্থানটি ছিল মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মোহনার কাছে। এখানে প্রাচীনকালে সম্ভবত আরব থেকে আগত একটি সেমিটিকভাষী দল বাস স্থাপন করেছিল। এরাই পরবর্তীকালে 'ক্যালডীয়' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

আসিরীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ক্যালডীয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'নোবোপোলাসর'। তাঁর পুত্র নেবুচাদনেজার-এর রাজত্বকালে (৬০৪-৫৬১ খ্রিঃ পূঃ) ক্যালডীয় সাম্রাজ্য এক নতুন বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়। ক্যালডীয় রাজশক্তির বিকাশ মেসোপটেমীয় সভ্যতার চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ের সূচনা করল। এ পর্যায়কে প্রায়শ 'নব-ব্যাবিলনীয়' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ ক্যালডীয়রা পুনরায় ব্যাবিলনে রাজধানী স্থাপন করেছিল এবং হাম্মুরাবির আমলের সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিল।

নেবুচাদনেজার আসিরীয় সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল অংশই অধিকার করেন। এমনকি আসিরীয়রা যাকে পদানত করতে পারেনি, সেই 'জুদা' রাজ্য পর্যন্ত তিনি করায়ত্ত করেন এবং সে দেশ থেকে কয়েক সহস্র লোককে দাস হিসেবে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। কিন্তু এ সাম্রাজ্যও স্থায়ী হয়নি। এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে, ৫৩৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পারস্যদেশীয় রাজা কাইরাস-এর হাতে এর পতন ঘটে একরূপ বিনাযুদ্ধে— কারণ, পুরোহিতশ্রেণী এবং অভিজাত ও প্রভাবশালী শ্রেণীসমূহ ও ইহুদিগণ পারসিকদের সহায় হয়েছিল।

নেবুচাদনেজারের চল্লিশ বছরের রাজত্বকালে ব্যাবিলন জাঁকজমক ও বৈভবে নিনেভের স্থান অধিকার করেছিল। প্রবাদ অনুসারে, নেবুচাদনেজার তাঁর মেডেস দেশীয় রানীর মনোরঞ্জনার্থে প্রাসাদের ছাদে এবং নগরপ্রাচীরের ওপরে যে উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন, আজও তা 'ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান' নামে প্রাচীনকালের সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতমরূপে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে।

পারস্য রাষ্ট্র অবশ্য সমস্ত মেসোপটেমীয় সাম্রাজ্যকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক অঞ্চলও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তদুপরি পারস্য সাম্রাজ্য ছিল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির বাহন। ক্যালডীয় সাম্রাজ্যের পতনকেই তাই মেসোপটেমীয় সভ্যতার ও মেসোপটেমিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের সমাপ্তিরূপে গণ্য করা চলে।

মেসোপটেমীয় সংস্কৃতির পরিচয়

আমরা সচারাচর যাকে এক কথায় 'মেসোপটেমীয় সংস্কৃতি' বলে থাকি, তা আসলে প্রধানত চারটি বিভিন্ন সভ্যতার অবদান নিয়ে গড়ে উঠেছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে এ চারটি সভ্যতা হলঃ 'সুমেরীয়', 'ব্যাবিলনীয়', 'আসিরীয়' এবং 'ক্যালডীয়'। অনেক সময় ব্যাবিলনীয় সভ্যতাকে 'আদি ব্যাবিলনীয়' এবং ক্যালডীয় সভ্যতাকে 'নব-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা' বলা হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা

সুমেরীয় অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মিশরীয়দের মতো অতখানি কঠোর ছিল না। রাজা রাজ্যের সমস্ত ভূখণ্ডের মালিক ছিলেন না। ব্যবসা- বাণিজ্যও সম্পূর্ণরূপে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল না। বরং বিপুল পরিমাণ জমি ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন পুরোহিতরা। যেহেতু ঋতুচক্রের আবর্তন কালের সময় নিরূপণ ও খালকাটার যান্ত্রিক কৌশল একমাত্র পুরোহিতদেরই জানা ছিল, অতএব সেচব্যবস্থা পুরোপুরি তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। বাকি জনগণের অধিকাংশই ছিল ভূমিদাস। এদের মধ্যে অনেকে আবার ঋণের দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত হত। তবে মিশর বা ব্যবিলনের মতো সুমেরীয় ক্রীতদাসদের অবস্থা ততখানি শোচনীয় ছিল না। তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত, মনিবদের কাছ থেকে অবসর পেলে অন্যত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতে পারত, এমনকি কোনো স্বাধীন রমণীকে বিয়েও করতে পারত।

কৃষিই ছিল সুমেরীয়দের প্রধান জীবিকা। প্রায় প্রতিটি সুমেরীয় কৃষক উন্নতমানের কৃষিকাজ জানতেন। শহরগুলোর বাইরে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র, উর্বর জমিতে লাঙল দিয়ে, বীজ ছিটিয়ে, উন্নত ধরনের সেচব্যবস্থার প্রচলন করে সুমেরীয় কৃষকরা তাতে ওট, যব, খেজুর ও বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাত। সুমেরীয়রাই প্রথম চাকা লাগানো গাড়ি ও রথের ব্যবহার শুরু করেছিল। তাদের কাছ থেকেই মিশরীয়রা চাকা লাগানো যানবাহনের ব্যবহার শেখে। সুমেরীয়রা ছাগল ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুও পালন করত।

তাদের দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা ছিল বাণিজ্য। দেশের সম্পদের একটি বিরাট উৎস ছিল এই বাণিজ্য। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সুমেরের উন্নত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সমুদ্র ও স্থল— এই দু' পথেই বাণিজ্য চলত। ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক, যেমন— বিল, রসিদ, হিসাবপত্র, হুণ্ডি, প্রভৃতির প্রচলন ছিল। চুক্তি সম্পাদন হত লিখিতভাবে, সাক্ষীর উপস্থিতিতে। ব্যবসায়ীরা মাল বিক্রির জন্যে লোক নিযুক্ত করতেন, যারা কমিশনের বিনময়ে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মাল বিক্রি করত। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নির্দিষ্ট ওজনের সোনা ও রুপার চাকতি ব্যবহৃত হত।

মিশরীয়রা খুব নিকটে বাস করার ফলে সুমেরীয়দের সভ্যতার সাথে মিশরীয় সভ্যতার বিপুল মিল পরিলক্ষিত হয়। মিশরীয়দের মতো সুমেরীয়দের সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য প্রবল ছিল। সমাজের কর্তা ছিলেন রাজা, পুরোহিত, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী ও সামরিক ব্যক্তিরা। দেশের জমি ও অন্যান্য সম্পদের অধিকাংশের মালিক ছিলেন তাঁরাই। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্য আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল।

আইন

সুমেরীয়দের আইন গড়ে উঠেছিল তাদের প্রচলিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। পরবর্তীকালে এগুলোকে সংকলিত করেন সুমেরীয় সম্রাট 'ডুঙ্গি'। সুমেরীয় আইন ছিল পরবর্তী অন্যান্য সভ্যতার, যথা— ব্যবিলনীয়, আসিরীয়, ক্যালডীয় ও হিব্রু আইনের মূল ভিত্তি। ব্যবিলনের বিখ্যাত আইন প্রণেতা 'হাম্মুরাবীর' আইন, সংকলন মূলত সুমেরীয় আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুমেরীয় আইনের মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) অপরাধীকে প্রতিটি অপরাধের জন্য তদ্রুপ শাস্তির বিধান দেয়া হত, যথা— চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত বা প্রতিটি অঙ্গের জন্যে সেই অঙ্গ ছেদন।

(২) বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয় উভয় উদ্যোগে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারকে উদ্যোগী হয়ে অপরাধীকে আদালতে হাজির করতে হত। আদালত বাদী-বিবাদীর মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করত, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে শুধুমাত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়।

(৩) সামাজিক মর্যাদা হিসেবে বিচার করা। সুমেরীয় আইনে সমাজের জনগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— (ক) অভিজাত, (খ) সাধারণ বা ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং (গ) ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। অপরাধীর শাস্তি বিধান হত তার সামাজিক মর্যাদা হিসেবে। কখনো কখনো অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে। একজন সাধারণ নাগরিক বা ভূমিদাস অথবা ক্রীতদাসের স্থলে কোনো অভিজাতকে হত্যা বা পঙ্গু করা হলে অধিকতর গুরুতর শাস্তি দেয়া হত। অনুরূপভাবে একজন অভিজাত যদি অপরাধী হতেন তাহলে একজন সাধারণ বা ভূমিদাস অপেক্ষা তাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হত। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সামরিক বাহিনীতে একমাত্র অভিজাতরাই প্রবেশাধিকার লাভ করতেন এবং সুমেরীয় সামরিক বাহিনী কঠোরভাবে তার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখত।

(৫) ইচ্ছাকৃত অপরাধ ও আকস্মিক ক্রোধজনিত কারণে সংঘটিত অপরাধের মধ্যেকার পার্থক্য ছিল সামান্যই। উভয়ক্ষেত্রেই অপরাধীকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হত।

ধর্ম

আইনের মতো সুমেরীয়দের ধর্মেও তাদের সমাজব্যবস্থা ও কৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। মিশরীয়দের মতো সুমেরীয়দের জীবনে ধর্ম একটি প্রধান স্থান দখল করে রেখেছে। সুমেরীয়রা অনেক দেবতায় বিশ্বাসী ছিল; তাদের সূর্যদেবতা ছিলেন শামাশ, এনলিল ছিলেন বৃষ্টির ও বায়ুর দেবতা। দেবী ইশতার ছিলেন নারী জাতির প্রতীক। সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা ছিলেন নার্গাল। দেবতারা ভাল ও মন্দ উভয় কাজেই পারদর্শী ছিলেন; যেমন, শামাশ সূর্যের দেবতারূপে পথিবীতে আলো ও উত্তাপ পাঠিয়ে মানুষের উপকার সাধন করতেন,তেমনি আবার তার প্রখর তেজে মাটি ও গাছপালাকে দগ্ধ করে মানুষের ক্ষতিসাধনও করতেন।

সুমেরীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস শুধুমাত্র ইহলোককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। পরলোক বলতে সুমেরীয়দের ধারণায় ছিল একটি অস্পষ্ট,ছায়াময় জগতের অস্তিত্ব— যেখানে মৃত মানবের আত্মা মাত্র অল্প কিছুকাল অবস্থান করে চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরকালে আবার মৃত আত্মার পুনরুজ্জীবন লাভ কিংবা স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি সম্বন্ধে সুমেরীয়দের মধ্যে কোনো ধারণাই জন্ম লাভ করেনি। সে জন্যেই সুমেরীয়রা মিশরীয়দের মতো সাড়ম্বরে মৃতদেহকে মমি বানাত না বা সমাধির ওপর বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করত না। তারা সাধারণভাবে মাটির নিচে মৃতদেহকে কবর দিত।

সুমেরীয়দের দেবতারা ছিলেন মানুষের মতোই সুখ-দুঃখ ও অন্যান্য অনুভূতিসম্পন্ন। তাদের কাজ ছিল ইহজগতেই মানুষের কল্যাণসাধন, যেমন ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বা প্রচুর শস্য উৎপাদন ইত্যাদি। সুমেরীয়দের ধর্মসঙ্গীতে

দেবতারা সত্যপ্রিয়, মঙ্গলসাধক ও ন্যায়বান প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত। দেবী ন্যাঙ্গেকে উল্লেখ করা হয়েছে অনাথ শিশুদের প্রতিপালন, বিধবাদের কষ্ট দূর করার জন্যে তাদের এ পৃথিবী থেকে তুলে নেয়া ও অত্যাচারীকে ধ্বংস করার দেবী হিসেবে। এ সকল দেব দেবীরাই আবার মিথ্যার, ঝগড়া-বিবাদ প্রভৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে একজন মানুষের চরিত্র নষ্ট করতে পরতেন।

সুমেরীয় ধর্মের প্রধান প্রকাশ ঘটেছিল তাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এবং প্লাবনের কাহিনীতে। সুমেরীয় বিশ্বাস অনুসারে তাদের ঈশ্বর মার্দুক মাটি ও ড্রাগনের রক্ত থেকে মানুষকে তৈরি করেছিলেন। একবার মার্দুক মানুষের ওপর বিরক্ত হয়ে প্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন। সুমেরীয়দের অনেক ধর্মবিশ্বাস পরবর্তীকালে হিব্রুদের ধর্মবিশ্বাসে স্থান পেয়েছিল।

সুমেরীয় সাহিত্য

সুমেরীয় সাহিত্য এক অর্থে মিশরীয়দের থেকে উন্নত ছিল— কারণ, সুমেরীয়রাই প্রথম মহাকাব্য রচনা করেছিল। তাদের বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম 'গিলগামেশ'। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আগেই এ মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। এর নায়ক গিলগামেশ একজন পৌরাণিক রাজা, যিনি নিজের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার করতেন। গিলগামেশ অমরত্ব লাভ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ মহাকাব্যে পৌরাণিক উপাখ্যানের সকল উপাদান, যেমন— বীরত্ব, প্রেম, বন্ধুত্ব, ব্যর্থতা সব কিছুই বিদ্যমান।

স্থাপত্য ও শিল্প

সুমেরীয়দের স্থাপত্যশিল্প মিশরীয়দের মত উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব লাভে সমর্থ হয়নি। পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন সুমেরীয়রা পোড়া ইট দিয়ে ইমারত বানাত। ফলে প্রচণ্ড বাত্যাপ্রবাহ ও মহাপ্লাবনের সম্মুখে এসব ইমারত দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি। সুমেরীয়রা নগরসভ্যতা গড়ে তুলেছিল। রাজপ্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সুমেরীয়দের নগর পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল। সুমেরীয়রাই প্রথম খিলান, ভল্ট ও গম্বুজনির্মাণের কৌশল শিখেছিল। দালানের দেয়ালগুলো ছিল ইটের এবং ছাদগুলো ছিল কাঠের তৈরি।

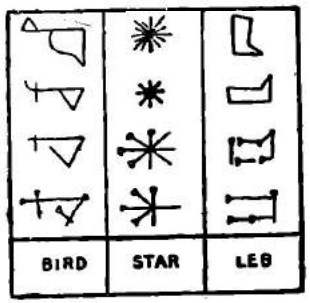

কিউনিফর্ম লিপির বিবর্তন

সুমেরীয়দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাদের জিগ্‌গুরাট বা ধর্মমন্দির। প্রতিটি শহরে একটি করে জিগ্‌গুরাট ছিল এবং এটি সেই শহরের দেবতার নামে উৎসর্গিত ছিল।

সুমেরীয়রা ধাতুশিল্পে উৎকর্ষ সাধন করেছিল। তারা অস্ত্রশস্ত্র, গহনা, মাটির পাত্র প্রভৃতির ওপর সুন্দর সুন্দর নক্‌শা তৈরি করত। সুমেরীয়দের তৈরি সীলের ওপরও সুন্দর শিল্পকর্মের নিদর্শন বর্তমান। এই সীলগুলো ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।

সুমেরীয়দের লিপি ও বিজ্ঞান

সুমেরীয়দের বিশিষ্ট কীর্তি হল সুবিখ্যাত 'কিউনিফর্ম' লেখন পদ্ধতির আবিষ্কার। এটি ছিল চিত্রলিপি। কালক্রমে তা' শব্দাংশভিত্তিক লিপিতে পরিণত হয়েছিল। এ সম্পর্কে আগেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সুমেরীয়রা সংখ্যা গণনা ও অঙ্কপাতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। তাদের গণনাপদ্ধতি ছিল ষাটভিত্তিক। সুমেরীয়দের মুদ্রা, ওজন এবং পরিমাণ পদ্ধতিও ছিল ষাটের এককভিত্তিক। সুমেরীয়রা গুণ, ভাগ, বর্গমূল নির্ণয় ও ঘনমূল নির্ণয় করতে পারত। সুমেরীয়রা পানি–ঘড়ি এবং চান্দ্রমাস আবিষ্কার করেছিল।

ব্যবিলনীয় যুগের সংস্কৃতি

সুমেরীয়দের পতনের পর আমোরাইট জাতি সুমের ও আক্কাদ জয় করে ব্যবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সভ্যতাকে প্রাচীন ব্যবিলনীয় সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে। আমোরাইটদের নিজেদের সংস্কৃতি বিশেষ উন্নত ছিল না, তারা মেসোপটেমিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপন করে সুমেরীয়দের সভ্যতা সংস্কৃতিকেই গ্রহণ করেছিল। ব্যাবিলনীয় যুগে তাই সভ্যতা সংস্কৃতির আংশিক অবক্ষয় ঘটে। এ যুগে সুমেরীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে নতুন কোনো আবিষ্কার যুক্ত হয়নি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ যুগে কিছু উন্নতি লক্ষ করা যায়। গিলগামেশ কাব্যকে এ যুগে আরো বিস্তৃতভাবে লেখা হয়। ব্যবিলনীয় যুগে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সাথে সাথে কুসংস্কার বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ যুগে জ্যোতিষচর্চা, ভাগ্যগণনা ও অন্যান্য যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ভূত-প্রেতের পূজাও এ যুগে বিশেষ রকম বৃদ্ধি পায়।

আসিরীয় সংস্কৃতি

আসিরীয় সাম্রাজ্য ছিল সমরবাদী। এ রাজশক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। এ যুগে তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বা সাংস্কৃতিক বিকাশ আশা করা যায় না। তথাপি সামরিক প্রয়োজনে আসিরীয় যুগেও কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। আসিরীয়রা সম্ভবত বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে বিভক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। ভূ-পৃষ্ঠকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ধরনে ভাগ করে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতিও সম্ভবত তারা আবিষ্কার করেছিল। তারা পাঁচটি গ্রহ আবিষ্কার করেছিল ও তাদের নামকরণ করেছিল। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগে থেকে গ্রহণকাল নির্দেশ করতেও পারত। সৈন্যদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে সে যুগে চিকিৎসাবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যার চর্চাও হয়েছিল। এ যুগে পাঁচ শতাধিক উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের গুণাগুণ ও ব্যবহারপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বিভিন্ন রোগের লক্ষণের বিবরণও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সাধারণত রোগের কারণকে প্রাকৃতিক বলেই মনে করা হত তবে যাদুমন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে ভূত-প্রেতকে বিতাড়িত করাকেও চিকিৎসার অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হত।

আসিরীয় স্থাপত্য ও শিল্প

নিজেদের গৌরবগাথা বৃদ্ধি ও প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিরীয় সম্রাটগণ বিশাল বিলাসপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। খোর্সাবাদে অবস্থিত সারগনের প্রাসাদ সম্রাটের শৌর্য ও

ক্ষমতার নিদর্শন। উঁচু চাতালের ওপর অবস্থিত, পুরু ও ভারি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রাসাদটি একটি দুর্গবিশেষ। এর মধ্যে অবস্থিত ছিল রাজকীয় ভবনসমূহ, রাজকীয় অশ্বশালা, একটি মন্দির ও একটি জিগ্‌গুরাট। প্রাসাদের প্রতিটি তোরণ ছিল ব্যবিলনীয়দের মতো খিলান-শোভিত।

প্রাসাদের প্রধান তোরণগুলোর দুপাশে নির্মিত ছিল প্রকাণ্ড মনুষ্যমস্তক বিশিষ্ট ডানাওয়ালা পাথরের তৈরি ষাঁড়দ্বয়। মানুষ বা পশুর মূর্তি নির্মাণে আসিরীয়রা তাদের শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দান করত। প্রাসাদের দেয়ালে অঙ্কিত রিলিফ চিত্রে আসিরীয়রা তাদের নির্মম ও নিষ্ঠুর চরিত্রের পরিচয় দান করত। বেশির ভাগ চিত্রেই ছিল যুদ্ধ ও পশু শিকারের দৃশ্য। মনুষ্যচিত্রগুলি থেকে পশুচিত্রগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত বাস্তবধর্মী। মনুষ্যচিত্রগুলো অধিকাংশ প্রকাণ্ড মস্তকবিশিষ্ট অনড় ও নিষ্প্রাণ। অন্যদিকে পশুচিত্রগুলি তাদের চলমান ভঙ্গি ও নিষ্ঠুর অথবা ভয়ার্ত রূপ নিয়ে অধিকতর বাস্তবধর্মী। আসিরীয়দের অধিকাংশ চিত্রে ঘোড়া ও সিংহের মূর্তি দেখা যায়, তবে মাঝে মাঝে অন্যান্য পশু অর্থাৎ গাধা, কুকুর, হরিণ, ছাগল ও বিভিন্ন ধরনের পাখির চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

আসিরীয় রাজাদের অতীত ইতিহাস সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা গেছে। রাজা আসুরবানিপাল ২২ হাজারেরও অধিক কাদা মাটির লিপির পাত সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর তৈরি গ্রন্থাগারে এগুলো সংরক্ষিত ছিল। সুমেরীয়দের প্রার্থনার সংগীত, ধর্মীয় অনুষ্ঠানরীতিসমূহ, ব্যাকরণ ও চিকিৎসাবিধিসমূহ এই লাইব্রেরিতে লিপিবদ্ধ ছিল। এ ছাড়া ছিল অসংখ্য চিঠিপত্র, ব্যবসাসংক্রান্ত কাগজপত্র এবং সামরিক অভিযানের বিবরণ। রাজা নিজে তাঁর আত্মজীবনীও লিখে গেছেন। এগুলো প্রত্যেকটি আসিরীয়দের ইতিহাসের মূল্যবান সূত্ররূপে বিবেচিত হয়।

ক্যালডীয় সংস্কৃতি

আসিরীয়দের পতনের পর মেসোপটেমিয়ায় ক্যালডীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যালডীয় যুগই মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সর্বশেষ পর্যায়। এ যুগকে 'নব-ব্যবিলনীয় যুগ'ও বলা হয়ে থাকে।

ক্যালডীয় যুগে বিজ্ঞানের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে ক্যালডীয় বিজ্ঞানীরা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন। ক্যালডীয় বিজ্ঞানীদের অবদান অবশ্য প্রধানত জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেই সীমিত রয়েছে। সাতদিনে সপ্তাহ ধরার হিসেব এরাই প্রবর্তিত করেছিল। ক্যালডীয়রা একদিনকে ১২টি জোড়া-ঘন্টায় ভাগ করেছিল, প্রত্যেক জোড়া ঘন্টায় ছিল ১২০ মিনিট করে সময়। আজ পর্যন্ত আমরা এই হিসাবই মেনে চলি। ক্যালডীয় জ্যোতির্বিদরা ৩৫০ বছর ধরে বিভিন্ন জ্যোতিষীর পর্যবেক্ষণ (যথা, গ্রহণ কাল ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্যালডীয়দের সাম্রাজ্যের পতনের পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ হিসেব রাখার কাজ অব্যাহত ছিল। ক্যালডীয়রা বছরের দৈর্ঘ্য প্রায় নিখুঁতভাবে নিরূপণ করতে পেরেছিল; এ হিসেবে মাত্র ২৬ মিনিটের ভুল ছিল।

ক্যালডীয় ধর্ম

জ্যোতির্বিদ্যায় ক্যালডীয়দের উৎসাহের পেছনে প্রধানত কাজ করেছে তাদের ধর্মীয় উদ্দীপনা। ক্যালডীয়রা এক জ্যোতিষীয় ধর্মের প্রচার করেছিল। দেবতাদের গতিবিধি থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা থেকেই ক্যালডীয়রা জ্যোতির্বিদ্যায় উৎসাহী হয়েছিল। ক্যালডীয় দেবতারা গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয়ে পরিচিত হতেন। এভাবে 'মার্দুক' হলেন 'জুপিটার' (বৃহস্পতি) ও 'ইস্তার' হলেন 'ভেনাস' বা শুক্র। কিন্তু ক্রমশ তারা মানুষের নাগালের বাইরে চলে যান এবং যাদুবিদ্যার দ্বারা তুষ্ট করে বা ভয় দেখিয়ে তাঁদের আর বশ করা যেত না। তাঁরা কেবল যান্ত্রিকভাবে জগৎটাকে চালিয়ে যেতেন। তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ অবহিত হলেও তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সব সময়েই মানুষের বোধগম্যের বাইরে থাকত।

এর ফল হল এই যে, মানুষ সম্পূর্ণভাবে হতাশার কবলে নিমজ্জিত হল। দেবতাদের মনের নাগাল পাওয়া যায় না, নিজের শক্তিতে অবস্থা পরিবর্তন করার ইচ্ছাশক্তিও ক্রমশ বিলুপ্ত হল এবং তার ফলে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল। ক্যালডীয়রা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না, তাদের ধর্ম ছিল ইহজগৎকেন্দ্রিক। যা' কিছু পাবার তারা এ জগতেই লাভ করার বাসনা পোষণ করত। তবুও সামগ্রিক হতাশাবোধ যখন তাদের প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করল, তখন অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় রইল না।

এই অদৃষ্টবাদ ও হতাশাবাদ থেকে জন্ম নিল মানুষের হীনমন্যতাবোধ। ক্যালডীয়দের প্রার্থনা-সংগীতে মানুষকে চিরন্তন পাপী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানবসন্তানরা সেখানে হাত-পা বাঁধা বন্দীরূপে চিত্রিত। তাদের এই দুঃখের কারণ তাদের পাপ।

এতদসত্ত্বেও ক্যালডীয়রা মধ্যযুগের ইউরোপের খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের মতো আত্মনিগ্রহ ও আত্মনির্যাতনের পথ বেছে নেয়নি— বরং তারা নিজেদের আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত রেখেছিল। তারা এটা ধরেই নিয়েছিল যে, মানুষ চেষ্টা করলেও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত রাখতে পারবে না। অতএব পার্থিব সুখের অন্বেষণ করাই যুক্তিযুক্ত। ক্যালডীয় প্রার্থনা- সংগীতে কখনো কখনো শ্রদ্ধা, দয়া, পবিত্রতা প্রভৃতিকে মানুষের গুণ এবং নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদ আরোপ ও ক্রোধকে দোষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি ক্যালডীয়রা দেবতাদের উদ্দেশ্যে যখন প্রার্থনা করত তখন তারা পবিত্র মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চাইত না, তাদের আবেদন ছিল দেবতা যেন তাদের দীর্ঘজীবন দান করেন, তাদের ঘর যেন সন্তান ও সম্পদে ভরে ওঠে।

ক্যালডীয়রা নতুন করে ব্যবিলনীয় সভ্যতার পুনরুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেনি— কেননা আসিরীয়দের রাজত্বকালে ব্যবিলনীয় সভ্যতা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। তা ছাড়া ক্যালডীয় নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পুরোনো সভ্যতা ছিল, যাকে তারা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারেনি। তা' সত্ত্বেও তারা পুরোনো আইন ও সাহিত্যের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিল, ফিরিয়ে এনেছিল অনেক প্রাচীন প্রথা ও আদর্শ, প্রতিষ্ঠিত করেছিল পুরোনো ব্যবিলনীয় শাসনপদ্ধতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যসমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

মেসোপটেমীয় সভ্যতা, বিশেষত ক্যালডীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। পারসিকরা ক্যালডীয় সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। হিট্টাইট, ফিনিশীয় এবং হিব্রুরাও মেসোপটেমীয় সভ্যতার দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিল। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অনেক উপাদান ও উপকরণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও প্রবেশ করেছে। আমাদের সময় মাপার হিসেব, কোণ মাপার হিসেব (যথা ৩৬০ ডিগ্রীতে চার সমকোণ) ইত্যাদি আমরা পেয়েছি মেসোপটেমীয়দের কাছ থেকে। এমন কি কোষ্ঠিগণনা, রাশিচক্র ইত্যাদি অপবিজ্ঞান এবং কুসংস্কারও আমরা পেয়েছি ক্যালডীয়দের কাছ থেকে।